জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬

কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

আবহমান কাল থেকে পদ্মা-যমুনা-মেঘনা বিধৌত প্রাকৃতিক সম্পদের লীলাভূমি বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। কৃষি এ দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে এ দেশের সহজ সরল অথচ সংগ্রামী জনগণ যুগযুগান্তরের শোষণ নিপীড়নের শৃঙ্খল ভেঙ্গে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লালসবুজ পতাকা। স্বাধীনতা অর্জনের মূল লক্ষ্যই ছিল বাঙ্গালী জাতির জন্য একটি শোষণ ও বঞ্চনাহীন সমাজ তথা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্যে সিংহভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য জাতির পিতার নির্দেশে বাংলাদেশের সংবিধানে সুনির্দিষ্ট ধারা সংযোজন করা হয়। তাঁর নির্দেশে কৃষি নীতিমালা প্রণয়নেরও কাজ শুরু হয়। কৃষির উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেশ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে যে দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তার নেতিবাচক প্রভাবে কৃষির অগ্রগতি থেমে যায়। যে কারণে কৃষিখাত পিছিয়ে পড়ে। কৃষকরা দুর্ভোগের শিকার হতে থাকেন। কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ব্যাহত হয়। সর্বোপরি কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্যের অভাবে তারা মানবেতর জীবন-যাপন করতে থাকেন।

মাটি ও মানুষের দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সকল সময়েই দেশের উন্নতির জন্য কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করে। এ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ বিভিন্নমুখী পদক্ষেপের ফলে কৃষকের নিকট কৃষি উপকরণ সহজলভ্য হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৫ সালে যেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল বার্ষিক ১৮০·৮০ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০০০ সাল নাগাদ তা বার্ষিক ২৬৭·৫৮ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যও সহনীয় পর্যায়ে চলে আসে। উক্ত মেয়াদেই প্রথম 'জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯' প্রণয়ন করা হয়। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় সরকার গঠনের পর কৃষিখাতে প্রণোদনাসহ বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি খাতকে ব্যাপকভাবে এগিয়ে নেয়। এর ফলে বর্তমানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় বার্ষিক ৪০০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কারণে দেশ বর্তমানে দানাদার খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। এ অবস্থাকে স্থায়ী রূপ প্রদান করা প্রধান একটি চ্যালেঞ্জ। কৃষি জমির গুণগত মান বজায় রাখা তথা পরিবেশের যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষির বর্তমান উন্নতিকে ক্রমশঃ আরো সফলতার দিকে নেয়া প্রয়োজন। 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-০২' তে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

অতীতে আমাদের দেশে জৈব কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কারণে কৃষিতে রাসায়নিক সার, বালাইনাশক প্রয়োগ এবং উন্নতমানের বীজের ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে কৃষির ফলন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হলেও মাটির স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উপর এর কিছুটা বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে জৈব কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন এখন সময়ের দাবী। বিশ্ব জুড়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ জৈব পণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশেও কৃষকদের জৈব সার ব্যবহার প্রচলন শুরু হয়েছে। এটা ব্যাপকভাবে প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। সে প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থায়ী অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' এর সফল বাস্তবায়ন কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'পটভূমি'

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে কৃষি খাত মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষি ও মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এ দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান উৎস হলো কৃষি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষির উন্নতি অপরিহার্য হওয়ায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশে কৃষির উন্নতির লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। কিন্তু ইতিহাসের জঘন্যতম ট্রাজেডির মাধ্যমে তাঁর পরলোক গমনের পর সকল কার্যক্রম থেমে যায়। দীর্ঘ ২১ বছর পর জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর পুনরায় কৃষি উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয় জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯। পরবর্তীতে আরো যুগোপযোগী করে জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। আওয়ামী লীগ তথা বর্তমান সরকারের কৃষি বান্ধব নীতির কারণে দেশে কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। অতীতের খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করে বাংলাদেশ খাদ্য শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। দানাদার খাদ্য শস্যের পাশাপাশি শাক-সব্জি এবং ফলমূল উৎপাদনেও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। এ সফলতাকে ধরে রাখাই আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ এবং এ জন্য প্রয়োজন টেকসই কৃষি ব্যবস্থাপনা।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি-রাসায়নিক এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ফসলের ফলন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে রাসায়নিক সার এবং বালাইনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও কৃষি পরিবেশের উপর কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। সে কারণে কৃষিতে প্রাকৃতিক পণ্য এবং পদ্ধতি ব্যবহারের দাবী জোরদার হচ্ছে। ইতোমধ্যেই প্রাকৃতিক পদ্ধতি যথা : পার্চিং, লাইট ট্রাপ, সেক্স ফেরোমেন ইত্যাদির মাধ্যমে পোকামাকড় দমন করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক কম্পোস্ট সার ব্যবহারের জন্য চাষীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমগুলি ইতোমধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

জৈব কৃষি পদ্ধতি জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় একটি অতি উপযোগী পদ্ধতি। আমাদের দেশে আদিকাল থেকে জৈব কৃষি পদ্ধতি চালু ছিল, প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় এর প্রভাব কমে এসেছে। তবে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের চাহিদা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রেক্ষাপটে জৈব কৃষি পদ্ধতির আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের ১৭২টি দেশে জৈব কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ হচ্ছে; তন্মধ্যে ৮৭টি দেশ জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন করেছে। সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ভারত ও ভুটান জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নেপালে জৈব কৃষি নীতি প্রণয়নের কাজ চলছে। বর্তমান বিশ্ব-বাণিজ্যে জৈব কৃষি একটি নতুন অধ্যায় এবং জৈব কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বে জৈব কৃষি পণ্যের বাজার ১৯৯৯ সালে ছিল ১৫·২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, বর্তমানে তা ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি পণ্য উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষাপটে উৎপাদিত কৃষি পণ্য রপ্তানি তথা টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের নিমিত্ত জৈব কৃষি নীতি প্রণয়ন করা জরুরী বিধায় কৃষি মন্ত্রণালয় হতে জৈব কৃষি নীতি প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ নীতি প্রণয়নকালে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয় পরিবেশ সংরক্ষণ তথা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার অংশ হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রণীত 'জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬' প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। প্রণীত নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমি মনে করি। কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এ নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে বলে আমি আশা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মতিয়া চৌধুরী)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	ভূমিকা	১
২.০	জাতীয় জৈব কৃষি নীতির উদ্দেশ্য	২
৩.০	জৈব কৃষি নীতি	৩
	৩.১ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ	৩
	৩.২ রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ	৩
	৩.৩ জৈবিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন	৪
	৩.৪ পরিবেশ বান্ধব ও দূষণমুক্ত সেচ ব্যবস্থাপনা	৪
	৩.৫ উপযোগী স্থান ও অঞ্চল নির্বাচন	৫
	৩.৬ ফসল নির্বাচন	৫
	৩.৭ শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ	৫
	৩.৮ সনাতন ও দেশজ জ্ঞানের সমন্বয়	৬
	৩.৯ কর্মসংস্থান	৬
	৩.১০ সমবায় সমিতি	৬
	৩.১১ সহায়তা	৬
	৩.১২ অভ্যন্তরীণ বাজার উন্নয়ন	৬
	৩.১৩ রপ্তানি বাজার	৭
৪.০	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি	৭
৫.০	আইনগত কাঠামো	৭
৬.০	উপসংহার	৮

জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬

১.০ ভূমিকা :

১.১ নদীমাতৃক বাংলাদেশ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই কৃষি প্রধান। কৃষি প্রধান এ দেশের কৃষক তথা আপামর জনসাধারণকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দেশ স্বাধীনের পরেই খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণের জন্য জাতির পিতা সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। তাঁর নির্দেশে সংবিধানে কৃষির উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ধারা সংযোজন করা হয়। ফলশ্রুতিতে কৃষি খাতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। পরবর্তীতে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশের কৃষিকে একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেন। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করে দেশ আজ খাদ্য শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের কৃষি তথা অন্যান্য সেক্টর বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

১.২ কৃষি খাতকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতির আওতায় পরিচালনার জন্য ১৯৯৯ সালে প্রথম জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে যুগোপযোগী আকারে জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি, রাসায়নিক সার এবং বালাইনাশকের ব্যবহারে ফসলের ফলন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার যাতে জনস্বাস্থ্য ও কৃষি পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি না করে সে জন্য সচেতন নাগরিক সমাজের মাঝে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের চাহিদা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে নিরিখে জৈব কৃষি (Organic Agriculture) বর্তমান বিশ্বে এক আলোচিত অধ্যায় ও দ্রুত বিকাশমান খাত হিসেবে বিবেচিত।

১.৩ উন্নত দেশসমূহে জৈব কৃষি পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে আর সেই চাহিদা পূরণ করতে উন্নয়নশীল দেশে এ চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলিত হচ্ছে এবং সে মোতাবেক জৈব কৃষি নীতিমালা প্রবর্তন করছে। বর্তমানে বিশ্বের ১৭২ টি দেশে জৈব চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে ৮৭ টি দেশে জৈব নীতি ও জৈব মানদণ্ড অনুসরণ করে অর্থাৎ একটা রেগুলেশনের অধীনে জৈব চাষাবাদ প্রচলিত হচ্ছে । উল্লেখ্য, সার্কভুক্ত কয়েকটি দেশসহ পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশে জৈব কৃষি নীতি বিদ্যমান ।

১.৪ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থা ছিল সাধারণ অর্থে জৈব-কৃষির প্রাক-অবস্থা। কালের বিবর্তনে কৃষি-রাসায়নিক ও ভূগর্ভস্থ পানির অতিমাত্রায় ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জৈব কৃষির প্রথম বিকাশ ঘটে বেসরকারি পর্যায়ে এবং '৯০ এর দশকের শুরুতে এর বিস্তৃতি লাভ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশ হতে চা ও চিংড়ি প্রত্যায়িত জৈব পণ্য হিসেবে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

১.৫ দীর্ঘমেয়াদী টেকসই কৃষি ও বিশ্ববাণিজ্যে টিকে থাকার নিমিত্ত জৈব কৃষি বিষয়ে প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক :

ক। **দীর্ঘমেয়াদী টেকসই কৃষির জন্য** : জাতির পিতার আহ্বানে 'সবুজ বিপ্লবের' সূচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতি থেকে বর্তমানে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছে। এই স্বয়ম্ভরতা অর্জনে কৃষি-রাসায়নিকের (Agro-chemicals) ব্যবহার অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। ফলে মাটি ও জনস্বাস্থ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিরূপ প্রভাব। এ প্রভাব হ্রাসকরণের অন্যতম উপায় জৈব-কৃষি; কেননা এটা মাটি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত বিধায় ক্রমান্বয়ে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই কৃষি সৃষ্টি করতে পারে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একান্ত কাম্য।

খ। **বাণিজ্যের নবদিগন্ত উন্মোচন** : বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যে জৈব-কৃষি একটা নতুন অধ্যায় এবং জৈব-কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশ জৈব-কৃষিনীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে বিশ্ব বাণিজ্যে উদীয়মান এই নব খাতে অংশগ্রহণ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। জৈব-মানদণ্ড অনুসরণ করে উৎপন্ন জৈব-কৃষিজাত দ্রব্য বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম নিয়ামক যা ক্রমবর্ধনশীল।

গ। **বিধি বিধানের আলোকে জৈব পণ্য সংক্রান্ত পরিচালনা** : জৈব-কৃষির চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে দেশে অনেক উদ্যোক্তা, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান জৈব-কৃষি দ্রব্যের উৎপাদনে এগিয়ে আসছে এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাজারজাত করছে। জৈব কৃষি নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিধি বিধান তৈরি করে সে অনুযায়ী জৈব কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। টেকসই কৃষি, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও বিশ্ব বাণিজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিম্নে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটা সুষ্ঠু জৈব কৃষিনীতি প্রবর্তন ও প্রচলন করা আবশ্যক।

২.০ জাতীয় জৈব কৃষি নীতির উদ্দেশ্য :

(১) মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলিকে যথোপযুক্ত সমন্বয় করে মৃত্তিকার উর্বরতা বজায় রেখে কৃষি কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(২) জৈব কৃষির উপযোগী অঞ্চল, স্থান ও ফসল সনাক্ত করা;

(৩) ফসল ভিত্তিক জৈব কৃষিতাত্ত্বিক উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা;

(৪) জৈব-কৃষির অন্যতম উপাদান জৈব-বীজ সহজলভ্য করা;

(৫) জৈব-কৃষির সাথে সংগতিপূর্ণ সনাতন ও দেশজ (Traditional & Indigenous) জ্ঞান ও প্রথা সনাক্তকরণ ও উৎপাদন কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ;

(৬) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে জৈব-কৃষি সম্পর্কিত দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা;

(৭) জৈব-কৃষির মানদণ্ড নির্ধারণ করা;

(৮) গুণগত মানসম্পন্ন জৈব-উপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহ সহজলভ্য করা;

(৯) জৈব পণ্যের গুণগত মান রক্ষণাবেক্ষণে জাতীয় মান অনুমোদন নীতি (National Accreditation Policy) প্রণয়ন করা;

(১০) জৈব কৃষির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যের সনদের (Certification) জন্য উৎপাদনকারীগণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা;

(১১) জৈব-কৃষি পণ্যের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে সহযোগিতা প্রদান করা; এবং

(১২) গুণগত মানসম্পন্ন জৈব-কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের অধিকতর আয়ের পথ সুগম করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

৩.০ জৈব-কৃষি নীতি :

৩.১. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমির উর্বরতা সংরক্ষণ :

৩.১.১ মৃত্তিকাস্থ জৈব পদার্থ ও অনুজীব সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ন্যূনতম কর্ষণ পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত করা হবে;

৩.১.২ কৃষক পর্যায়ে কম্পোস্ট, অনুজীব ও অন্যান্য জৈব সার উৎপাদন এবং সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং উৎপাদিত সারসমূহের গুণগত মান পরীক্ষার ব্যবস্থা সহজতর করা হবে;

৩.১.৩ খামার জাত সার, পোল্ট্রী ম্যানিউর, শহর ও পল্লীর কম্পোস্ট এবং বায়োস্লারী ব্যবহারের মাধ্যমে মাটিতে জৈব পদার্থ বৃদ্ধির কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৩.১.৪ শস্য অবশিষ্টাংশ পুনঃচক্রায়নের মাধ্যমে মাটির সাথে মিশ্রণকে উৎসাহিত করা হবে; এবং

৩.১.৫ মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সবুজ সার ও ডাল জাতীয় ফসলের সমন্বয়ে উপযুক্ত শস্য পর্যায় অনুসরণের জন্য সচেতন করা হবে।

৩.২ রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ :

৩.২.১ ফসলের বপন ও উত্তোলন সময় পরিবর্তন, আলোক ফাঁদ, ফাঁদ শস্যের ও প্রতিরোধী জাত ব্যবহার এবং সেক্স ফেরোমোন ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে বালাই দমনকে উৎসাহিত করা হবে;

৩.২.২ বিভিন্ন রকম উপকারী পোকার লালন ও কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৩.২.৩ দেশে জৈব কৃষির জন্য অনুমোদিত কার্যকরী অনুজীব (Effective Micro Organism, EMO) এর উৎপাদন ও বিদেশ হতে জৈব বালাইনাশক আমদানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে;

৩.২.৪ বিভিন্ন উদ্ভিদজাত উপদ্রব্য ও দেশীয় অক্ষতিকর কাঁচামালের সমন্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ে জৈব বালাইনাশক তৈরি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে; এবং

৩.২.৫ বিভিন্ন পোকা দ্বারা রোগের আক্রমণ সম্পর্কে আগাম সতর্কীকরণ ও করণীয় বিষয়ে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৩.৩ জৈবিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন :

৩.৩.১ জৈবিক অনুজীব ও প্রাকৃতিক শত্রু (Natural enemy) ব্যবহারের মাধ্যমে আগাছা দমনকে অনুপ্রাণিত করা হবে;

৩.৩.২ পরিচর্যা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে আগাছা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে;

৩.৩.৩ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাবড়া (Mulch) ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে; এবং

৩.৩.৪ আগাছা প্রতিরোধী/সহনশীল জাত উদ্ভাবনে প্রয়াস নেয়া হবে।

৩.৪ পরিবেশ বান্ধব ও দূষণমুক্ত সেচ ব্যবস্থাপনা :

৩.৪.১ সেচের জন্য দূষণমুক্ত পানি সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে; পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির বিস্তারকে উৎসাহিত করা হবে;

৩.৪.২ জলাধার নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি, বন্যার পানি সংরক্ষণ করতঃ সেচ কার্যে ব্যবহারকে সরকার উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদান করবে এবং এভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে আনা হবে;

৩.৪.৩ নবায়নযোগ্য শক্তিকে সেচ কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৩.৪.৪ সেচ এর জন্য পানির উৎস দূষণকারী বস্তুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শক্তিশালী করা হবে; এবং

৩.৪.৫ ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ/সবজি বাগান কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হবে।

৩.৫ উপযোগী স্থান ও অঞ্চল নির্বাচন :

৩.৫.১ যে সমস্ত এলাকায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার সর্বনিম্ন কিংবা আদৌ ব্যবহার হয়নি, সেসব অঞ্চলে প্রথমে জৈব চাষাবাদের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অঞ্চলে জৈব চাষাবাদের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৩.৫.২ পাহাড়ী এলাকায় জৈব চাষাবাদকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে; এবং

৩.৫.৩ চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল, বসত ভিটা ও অন্যান্য বিশেষ এলাকা যা জৈব কৃষির আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, এমন এলাকায়ও জৈব চাষাবাদ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হবে।

৩.৬ ফসল নির্বাচন :

৩.৬.১ বাংলাদেশে প্রচলিত সম্ভাবনাময় সকল ফসলকে জৈব-চাষে উৎসাহিত করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শাক-সবজি, ফল-মূল, আলু, সুগন্ধি ও সরু চাউল, ডাল, গম, ভূট্টা, চা, ইক্ষু ও ফুল জৈব চাষাবাদের আওতায় আনার জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ফসলকে জৈব চাষের আওতায় আনা হবে।

৩.৬.২ বন্য মধু, মোম ও বাঁশকে জৈব চাষাবাদের আওতায় সংগ্রহের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৩.৭ শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ :

৩.৭.১ শিক্ষা ব্যবস্থায় জৈব-কৃষি সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হবে;

৩.৭.২ জৈব কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞান সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ভাণ্ডার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৩.৭.৩ ফসলভিত্তিক জৈব কৃষি চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা ও এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি জোরদার করা হবে;

৩.৭.৪ জৈব কৃষি সম্পর্কিত কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষক, সম্প্রসারণবিদ, কৃষক, রপ্তানিকারক, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জৈব কৃষি প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে;

৩.৭.৫ জৈব-কৃষিভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হবে; এবং

৩.৭.৬ জৈব কৃষি বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে।

৩.৮ সনাতন ও দেশজ (Traditional & Indigenous) জ্ঞানের সমন্বয় :

৩.৮.১ দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা সনাতন ও দেশজ (Traditional & Indigenous) প্রথা, ধারণা ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা এবং তাদের মূল্যায়ন সাপেক্ষে জৈব ফসল উৎপাদনে সম্পৃক্তকরণকে উৎসাহিত করা হবে ।

৩.৯ কর্মসংস্থান :

৩.৯.১ কৃষক পর্যায়ে জৈব কৃষির বিভিন্ন উৎপাদন উপকরণ যেমন- জৈব সার, জৈব বালাইনাশক ও জৈব বীজ উৎপাদনে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে;

৩.৯.২ স্থানীয় সম্পদ ও দেশজ জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক মূল্যের জৈব দ্রব্য উৎপাদনে প্রান্তিক কৃষকদের সহযোগিতা করা হবে; এবং

৩.৯.৩ মৌমাছি পালনের মাধ্যমে জৈব মধু উৎপাদনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.১০ সমবায় সমিতি :

৩.১০.১ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জৈব কৃষক ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে সমিতি প্রতিষ্ঠা করা;

৩.১০.২ জৈব পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ বা দলীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে গুরুত্ব প্রদান করা; এবং

৩.১০.৩ জৈব বীজ সংরক্ষণের জন্য গোষ্ঠীভিত্তিক বীজ ব্যাংক (Seed Bank) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩.১১ সহায়তা :

৩.১১.১ জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩ এ "কৃষি বিপণন" উপখাতে বর্ণিত কৃষকদের জন্য প্রযোজ্য সুবিধাসমূহ জৈব কৃষকদের জন্যও প্রযোজ্য বলে বিবেচ্য হবে; এবং

৩.১১.২ জৈব সার, জৈব বালাইনাশক উৎপাদন ও জৈব কৃষিখাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে ।

৩.১২ অভ্যন্তরীণ বাজার উন্নয়ন :

৩.১২.১ বাজার গবেষণা ও ব্যবসা নির্দেশিকার মাধ্যমে কৃষক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে জৈব কৃষি পণ্যের বাজার উন্নয়নে সহযোগিতা করা হবে;

৩.১২.২ দেশে উৎপাদিত জৈব পণ্য বিভিন্ন শহরে বিদ্যমান চেইন শপে পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেয়া হবে; এবং

৩.১২.৩ অংশগ্রহণমূলক গ্যারান্টি সিস্টেমস (Participatory Guarantee Systems) প্রবর্তনে সহযোগিতা করা হবে।

৩.১৩ রপ্তানি বাজার :

৩.১৩.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন জৈব পণ্য মেলা/বাণিজ্য প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজার অনুসন্ধান ও ব্যবসায়ীদের সাথে সুদৃঢ় বন্ধন তৈরি করতে সহযোগিতা করা হবে;

৩.১৩.২ রপ্তানি বাজারে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা অর্জনে দলীয় সনদের (Group Certification) ব্যবস্থা করা হবে; এবং

৩.১৩.৩ বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের জৈব কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে ।

৪.০ প্রাতিষ্ঠানিক নীতি :

৪.১ কৃষি মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় জৈব কৃষি টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমন্বয় করবে, যার দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ :

৪.১.১ সারা দেশে জৈব কৃষি কর্মসূচি উন্নয়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন;

৪.১.২ জাতীয় জৈব মানদণ্ড নির্ণায়ন অর্থাৎ জৈব কৃষি উৎপাদনে IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movement) বা অন্য যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড অনুসরণ সাপেক্ষে ব্যবহৃত পদার্থ (বস্তু) ও পদ্ধতি স্থিরকরণ;

৪.১.৩ জাতীয় জৈব কৃষি মান অনুমোদন (অ্যাক্রেডিটেশন) নীতি প্রণয়ন করা; এবং

৪.১.৪ প্রত্যয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত উপযুক্ত পরিদর্শন ও প্রত্যয়ন সংস্থাকে চিহ্নিত করা ও বৎসরান্তে নবায়নের সুপারিশ করা ।

৫.০ আইনগত কাঠামো :

৫.১ জৈব কৃষি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হবে; এবং

৫.২ প্রাসঙ্গিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হবে।

৬.০ উপসংহার :

৬.১ জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের চাহিদা তথা বাজার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বিশ্বব্যাপী এর জনপ্রিয়তা তৈরি হচ্ছে। বাস্তবতা বিবেচনায় অনেক উন্নয়নশীল দেশ রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থা থেকে জৈব কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে এবং তদনুসারে 'জাতীয় জৈব কর্মসূচি' প্রণয়ন করছে। বাংলাদেশে জৈব কৃষির এক বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক জৈব বাজারের সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। এ প্রেক্ষিত বিবেচনায় কৃষক, গবেষক, সম্প্রসারণবিদ, নীতি নির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের প্রায়োগিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে "জাতীয় জৈব কৃষি নীতি-২০১৬" প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতির সঠিক প্রয়োগে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই কৃষিব্যবস্থা ও রপ্তানি বাণিজ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

৬.২ "জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬" এর কোন বিষয় "জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩" এর সাথে সাংঘর্ষিক হলে তা "জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩" এর আলোকে সমন্বয় করা হবে।

বাঃসঃমুঃ-৪৯৩৫ কম(বি-৩)/২০১৬-১৭—২,০০০ বই, ২০১৭।